Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 103
Website: https://tirj.org.in, Page No. 910 - 913
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 910 - 913
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

প্রসঙ্গ : রাগ-প্রকার

ড. সুতপা বন্দ্যোপাধ্যায়
ত্রিশুলাপট্টি, বোলপুর, বীরভূম
Email ID : sutapabandyopadhyay008@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Gandhorbo, Marg, Rāga, Deshi, Ālapti, Bostu, Dhrubā.

Abstract
If we try to research the evolution of ragas and ragini by churning out the famous texts of ancient Indian music, we will definitely come to the conclusion that the first song in ancient times was 'Gandharbo rag' or 'Marg Raga', and later in the post-Christian era, Desi Raga emerged. The types of Gandharva or Marga ragas are: - 1) Gram-ragas, 2) Upo-ragas, 3) Bhasha-Vibhasha-Antarbhasha ragas. On the other hand, there were different types of regional ragas - 'raganga', 'kriyaanga', 'pure salag-sankirna', etc. The ancient Gandharva ragas were performed in two ways. For example- a) In songs with one object called 'Dhruba' b) In songs with one to seven objects called 'Prakaran'. But the native ragas were used in songs with 'Prabandho' or 'Pada', where there were two to four 'dhatus' (Udgraha, Melapak, Dhruba and Avoga). Since raga was used in 'Prabhandagan', 'alapti' or 'alap', that is, the unbounded form of raga, was necessarily expressed.

Discussion

‘রাগ’ বলতে ঠিক কী বোঝায়, এ সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে যাঁরা রাগ-সংগীত চর্চা করেন, তাঁদের এ সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট ধারণা আছে বলে মনে হয় না। বাধ্য হয়ে আমাদের প্রাচীন সংগীতশাস্ত্রের পৃষ্ঠাগুলি ওল্টাতেই হবে। দুঃখের বিষয়, মতঙ্গ-মুনি রচিত ‘বৃহদ্দেশী’ (আনুমানিক ৫ম-৬ষ্ঠ খ্রিষ্টাব্দ) গ্রন্থের পূর্বে রাগের সংজ্ঞা কোথাও পাওয়া যায় না। ‘বৃহদ্দেশী’ গ্রন্থের ‘রাগলক্ষণম’ অধ্যায়ের শুরুতে মতঙ্গ লিখেছেন[১] -

“কিমুচ্যতে রাগশব্দেন কিংবা রাগস্য লক্ষাণম্।
ব্যুৎপত্তি লক্ষনং তস্য যথাবদ বক্তুমহর্ষি॥”

অর্থাৎ, ‘রাগ’ শব্দের অর্থ, লক্ষণ, ব্যুৎপত্তি কিরূপ, তার যথাযথ বর্ণনা আমি করব।

‘মতঙ্গ উবাচ -

“রাগমার্গম্য যদরুপং যন্ত্রোক্তং ভরতাদিভিঃ।
নিরুপ্যতে তস্মাভির্লক্ষ্য লক্ষনসংযুতম্॥”

অর্থাৎ, মতঙ্গ বলছেন -

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 103
Website: https://tirj.org.in, Page No. 910 - 913
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ভরত প্রভৃতি সংগীতজ্ঞানীরা যেখানে মার্গ-রাগের (অর্থাৎ গান্ধর্ব-রাগের) কথা বলেননি, তাই আমি তাদের লক্ষ্য (অর্থাৎ ক্রিয়াত্মক রূপ) ও লক্ষণ নিরূপণ করেছি।

'তত্রাদৌ-

"স্বর-বর্ণ-বিশিষ্টেন ধ্বনিভেদেন বা পুনঃ।
রজ্যতে যেন সচ্চিত্তংস রাগঃ সম্মতঃ সতাম্।"

অর্থাৎ, প্রথমেই বলছি –

বিশিষ্ট স্বরসমূহ, (বর্ণ স্থায়ী, আরোহী, অবরোহী ও সঞ্চারী) এবং ধ্বনিভেদ দ্বারা সৎচিত্ত (অর্থাৎ শিক্ষিত-জ্ঞানী) ব্যক্তিদের মনোরঞ্জন করে তাকে সর্বদাই রাগ বলে।

অথবা, -

"যোহসৌ ধ্বনিবিশেষস্থ স্বর-বর্ণ-বিভূষিতঃ।
রঞ্জকো জনচিত্তানাং স রাগ কথিতো বুধৈ॥
রজনাজ্জায়তে রাগো ব্যুৎপত্তিঃ সমুদাহৃতা।"

অথবা, এই রকমই ধ্বনি-বিশেষে স্বর-বর্ণ ইত্যাদি বিভূষিত, সাধারণ মানুষের মনোরঞ্জককেই পণ্ডিতেরা রাগ বলেছেন। রাগ শব্দের ব্যুৎপত্তি রঞ্জন শব্দ থেকে।

এখন প্রশ্ন হল রঞ্জন অর্থাৎ রঞ্জকত্ব সৃষ্টি কিভাবে এবং কোন্ কোন্ গীত-উপাদানকে ভিত্তিক করে হবে। কারণ, গীতের উপাদান অনেক প্রকার, যথা - সুর, স্বর, তাল, ছন্দ, ভঙ্গি ইত্যাদি। উপাদান যে প্রকার হোক না কেন তা যেন শ্রুতিমধুর হয়। এই কথা ভেবেই, সম্ভবত, প্রাচীন গান্ধর্ব বা মার্গ সংগীত-জ্ঞানীরা রাগের কতকগুলি লক্ষণ তৈরী করেন। এগুলি হল গ্রহ (রাগের প্রারম্ভিক স্বর), অংশ (রাগের বাদী এবং সংবাদী), ন্যাস্ (বিশ্রান্তিমূলক স্বর), অপন্যাস (স্বল্প-বিশ্রান্তিমূলক স্বর), অল্পত্ব (দুর্বল স্বর), বহুত্ব (অংশ-স্বর ব্যতিরেকে প্রবল-স্বর), তার (সর্বোচ্চ স্বর), মন্দ্র (সর্বনিম্ন স্বর), ষাড়বিত (মাঝে-মধ্যে সাত-স্বরের রাগের দুর্বল-স্বরকে বর্জন করে ছয়-স্বরে রূপান্তরিত করা), এবং ঔড়বিত (সাত-স্বরের কিংবা ছয়-স্বরের রাগের ২টি কিংবা ১টি দুর্বল স্বর বর্জন করে মাঝে মধ্যে পাঁচ স্বরের রাগে রূপান্তরিত করা)। এই হল প্রাচীন গান্ধর্ব বা মার্গ-রাগের লক্ষণ।[২] নিয়মের জটিলতার জন্য গান্ধর্ব বা মার্গ রাগগুলি খ্রিষ্টাব্দের প্রায় শুরুতেই লুপ্ত হয়ে যায়, অথবা 'দেশী' বা আঞ্চলিক রাগের সঙ্গে মিশে যায়।

বাস্তব দৃষ্টিতে মনের কোনও এক বিশিষ্ট ভাবকে লক্ষণ-যুক্ত সুর দ্বারা প্রকাশ করাকে 'রাগ' বলে। তাই রবীন্দ্রনাথ রাগকে 'ভাব' বলেছন (সংগীত চিন্তা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং যে-কোনও সুর 'রাগ হতে পারে না'। বিশিষ্ট লক্ষণ ও ভাব থাকতে হবে। 'দেশী' রাগের ক্ষেত্রে লক্ষণ বা নিয়মের কড়াকড়ি না থাকলেও ভাবের নির্দিষ্টতা থাকতো। ভাবকে স্পষ্টীকরন করার জন্য ভাষার প্রয়োজন হয়, শুধু সুর ও ছন্দ দিয়ে 'রাগ'কে পূর্ণাঙ্গ রূপে প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

আবার, ভাবের মুখ্য উপাদান হচ্ছে 'ভঙ্গি' (gestures)। ভঙ্গি নানা প্রকার হয়, যথা - স্বর-ভঙ্গি, সুর-ভক্তি, ভাষা-ভঙ্গি, উচ্চারণ-ভঙ্গি, ছন্দ-ভঙ্গি, বাদন-ভঙ্গি, নর্তন-ভঙ্গি, গেয়-ভঙ্গি...ইত্যাদি। এদের মধ্যে 'গেয়-ভঙ্গি'কে গীতি যা আঞ্চলিক। পরবর্তীকালে, এই গীতি 'দেশী' প্রবন্ধগানের যুগে 'বান' বা 'বানী' রূপে প্রচলিত ছিল। সুরাশ্রয়ী গীতিকে' রাগ-গীতি এবং সুরাশ্রয়ী গীতিকে জাতি-গীতি বলা হতো। রাগ-গীতি পাঁচ প্রকার, যথা- শুদ্ধ, ভিন্না, গৌড়ী, রেসরা ও সাধারণী। জাতিগীতিগুলি চার প্রকার, যথা- মাগধী, অর্ধমাগধী, সম্ভাবিতা ও পৃথুলা। রাগগীতিগুলি ছিল আঞ্চলিক সুরাশ্রয়ী, তেমনি জাতি-গীতিগুলি ছিল তালাশ্রয়ী। এই তাল কিন্তু গান্ধর্ব বা মার্গতাল। এই তাল-পদ্ধতি কিন্তু অধুনা হিন্দুস্থানী কিংবা কর্ণাটক পদ্ধতির মতন নয়। মার্গ-তালের মোট সংখ্যা ৫টি, যথা– i. চাচ্চৎপুটঃ; ii . চাচপুটঃ; iii. ষট্ পিতাপুত্রকঃ; iv. সংপক্কেষ্টাক; এবং v. উদঘট্ট। কিন্তু মার্গ- ভেদে (যখা- চিত্রমার্গ, বৃত্তি বা বার্তিক মার্গ, দক্ষিণ-মার্গ এবং ধ্রুব-মার্গ) ও কলা-ভেদে (যথা- এক-কল, দ্বিকল, এবং চতুষ্কল) তালের অবয়ব ছোট-বড় হয়। ফলে, তালের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়।

রাগের আলোচনা প্রসঙ্গে একটি কথা জানিয়ে রাখা ভালো যে, গন্ধর্ব জাতির সংগীত-সমাজে দুটি প্রধান সম্প্রদায় ছিল। একটিকে বলা হত - নাট্য-সম্প্রদায় বা ভরত-সম্প্রদায় এবং অপরটিকে বলা হত গীত-সম্প্রদায় বা নারদ-সম্প্রদায়।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 103
Website: https://tirj.org.in, Page No. 910 - 913
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ভরত সম্প্রদায়ের সংগীত জ্ঞানীরা তাঁদের নৃত্যনাট্যে দুটি ‘অঙ্ক’ অথবা দৃশ্যের মধ্যবর্তী সাময়িক বিশ্রাক্তিতে যবনিকা বা পর্দার অন্তরালে একপ্রকার ছোট ছোট এক-তুকের গান পরিবেশিত হত, সেগুলিকে বলা হত ‘ধ্রুবা’ [ধ্রুপদ' নয়]। ধ্রুবা কখনো গ্রাম-রাগে, কখনো বা ‘জাতি’তে পরিবেশিত হত। জাতির সংখ্যা ছিল মোট ১৮টি। সাতটি স্বরের নামে ৭টি শুদ্ধ জাতি ষাড়জী, আর্জভী, গান্ধারী, মধ্যমা, পঞ্চমী, ধৈবতী ও নৈষাদী)। অবশিষ্ট ১১টি বিকৃত জাতি তৈরী হয়েছিল শুদ্ধ জাতিগুলির মধ্যে আন্তর-মিশ্রণ ঘটিয়ে। ইংরেজীতে এদের Modes বলা হয়। রাগকে Melodies বলে। জাতিগুলির সুর ছিল কাটা-কাটা (অনেকটা ঠাটের স্বরাবলীর মতোন। তাই এতে রঞ্জকত্ব সৃষ্টির জন্য তাল ও ছন্দ-ভিত্তিক ‘জিতিভিত্তিক’ জাতি-গীতি (মাগধী, অর্ধমাগধী, সম্ভাবিতা ও পৃথুলা) প্রয়োগ করা হত। এই কারণেই আমরা ভরত-মুনির ‘নাট্যশাস্ত্র’ গ্রন্থে আমরা ‘জাতি’ ও ‘জাতি-গীতি’র বিস্তৃত আলোচনা পেয়েছি। কোথাও ‘রাগ’ এবং ‘রাগ-গীতি’-র (শুদ্ধা, ভিন্না, গৌড়ী, বেসরা, সাধারণী) আলোচনা পাইনি। কারণ, ‘রাগ’ বিষয়ক যাবতীয় চর্চা গীত-সম্প্রদায় বা নারদ-সম্প্রদায়ের এক্তিয়ারভুক্ত। পরবর্তীকালে (আনুমানিক খ্রিষ্টিয় ২য় শতকে) ‘জাতি-গান’ লুপ্ত এবং অপ্রচলিত হয়ে পড়লে, ভরত-সম্প্রদায়ের নাট্য-পন্থীরা গ্রাম-রাগ, রাগ-গীতি ইতাদিনে মান্যতা দেয় এবং নিজ নিজ গ্রন্থের মাধ্যমে প্রচার করতে থাকে যে, ‘জাতি’ থেকেই গ্রাম-রাগ, উপরাগ, জাতি-রাগ ইত্যাদি জন্মেছে। এই সিদ্ধান্তের সমর্থন আমরা ভরতের ‘নাট্যশাস্ত্র’ গ্রন্থেও পাই। যেমন -

১. ‘‘জাতি সম্ভূতত্বাদ্ গ্রামরাগানাম্...,’’
(অর্থাৎ গ্রামরাগগুলি ‘জাতি’ থেকেই জন্মেছে)
২. ‘‘জাতিসম্ভূতত্বাদ্ রাগানাম্’’
(অর্থাৎ রাগ বা জাতি-রাগ 'জাতি' থেকেই জন্মেছে)
৩. ‘‘যৎকিঞ্চিদ্গীয়তে লোকে তৎসর্বং জাতিষু স্থিতম্-।’’
(অর্থাৎ লোকে যা-কিছু গায়, সেগুলি সবই জাতিতে স্থিত হয়)

বর্তমানে প্রাপ্ত নাট্যশাস্ত্রের সংস্করণগুলিতে উপরোক্ত শ্লোকগুলি খুঁজে না পাওয়া গেলেও, নিঃশঙ্ক শারঙ্গদেব রচিত ‘সংগীত-রত্নাকর’ গ্রন্থের ‘রাগ-বিবেকাধ্যায়-এর’ ৮ নং ১৪ নং শ্লোকের পঃ কল্লিনাথ প্রদত্ত ‘কলানিধি’ টাকায় এবং রাজা সিংহভূপাল লিখিত ‘সুধাকর’ টিকায় শ্লোকাংশগুলি উদ্ধৃত হয়েছ।

প্রাচীনকাল থেকেই রাগের সঙ্গে উত্তর-ভারতে ‘গেয়-ভঙ্গি’ বা গীতি-র সম্পর্ক অতি নিবিড়। গেয়-ভঙ্গি বা গীতি হচ্ছে আঞ্চলিক গাইবার ভঙ্গি, যা পরবর্তীকালে প্রবন্ধ-গানে অনুসরণ করা হত এবং মধ্যযুগীয় ধ্রুপদ-গানে ‘বানী’ বা ‘বান্’ নামে সুপ্রসিদ্ধ হয়েছিল। ‘ঘরানা’ পরিভাষাটি ধ্রুপদ-গানে সংযুক্ত হওয়ার পূর্বে ‘বান্’ পরিভাষাটি সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল। যেমন - মিঞা তানসেন ‘গওরহারী’ (অর্থাৎ গোয়ালিয়রী), করীম বকস্ খণ্ডারী, গুলাম হুসেন নৌহারী ইত্যাদি।

প্রাচীন গান্ধর্ব বা মার্গ রাগগুলির গীতিগুলির বিশ্লেষণ করলে আমরা সবকয়টি বানী বা বানের উৎসমূলে পৌঁছতে পারি। যেমন- শুদ্ধগীতিতে রাগ-স্বরের চলন অবক্র অর্থাৎ সরল ও ললিত এবং মীড়’ যুক্ত। এর থেকে দু'প্রকার বানের সম্ভাবনা দেখা দেয়, যথা - ১) সরল-গতিসম্পন্ন, গমক-যুক্ত এবং অন্যান্য বক্রগতির দ্রুত-অলংকার বর্জিত গান; ২) সরল গতি-যুক্ত মীড়-প্রধান গান। প্রাচীন ধ্রুপদ-গায়কেরা প্রথম প্রকারকে বলতেন ‘ডগর’-বান (দিল্লীর নিকটবর্তী অঞ্চলে দুটি গড়বা দুর্গের মধ্যবর্তী অঞ্চলে প্রচলিত গেয়-রীতি এবং দ্বিতীয় প্রকার ছিল গোয়ালিয়র ও তার চার-পাশের অঞ্চলে গাইবার ঢঙ।

ভিন্নাগীতির স্টাইলে বক্র স্বর-সঞ্চারণ, সূক্ষ বা দ্রুতোচ্চারিত স্বরসমূহের উচ্চারন এবং মধুর, ছোট ছোট গমকে। এই গীতির বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে রাজস্থানের পূর্বাঞ্চলে প্রসিদ্ধ গেয় ভঙ্গির সঙ্গে ধ্রুপদের খাণ্ডারী বানের সঙ্গে আশ্চর্য মিল রয়েছে। এরপর আসছে গৌড়ী-গীতি। এই গীতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, মন্দ-মধ্য ও তার স্থানে ভারী গমকের প্রয়োগ এবং ‘ওহাটী নামক স্বর-প্রক্ষেপণের ব্যবহার। গৌড়ী-গীতির ব্যাপারে দুটি মত রয়েছে সংগীত জ্ঞানীদের মধ্যে। এক সম্প্রদায় বলেন, গৌড়-বাংলার পশ্চিম অঞ্চলে এই ধরণে গাইবার ঢঙ্ একসময়ে প্রচলিত ছিল। যে-কারণে বাংলা কীর্তনে এর প্রভাব আজও অল্প বিস্তর শোনা যায়। আরেক মতে বলা হয়, গোঁড় অঞ্চলের (গন্ডোয়ানা ল্যান্ড বা মধ্যপ্রদেশ ও বাংলার সীমান্ত অঞ্চলে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 103
Website: https://tirj.org.in, Page No. 910 - 913
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

উপজাতীয় গানের মধ্যে এই জাতীয় ভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়। একে ‘গয়ড়া’ বান বলা হত। আজ অবশ্য এই বান অবলুপ্ত। পরবর্তী গীতি হচ্ছে ‘বেসরা’ বা ‘বেগস্বরা’। এই ধরণের গেয়-ভঙ্গি পাঞ্জাব অঞ্চলে দেখা যায়। এই গীতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দ্রুত স্বর-সঞ্চারণ এবং তজুনিত যে-সব অলংকার উৎপন্ন হতে পারে (যথা- খড্ডা, মূরক্, জমজমা ইত্যাদি প্রকৃতির পাঞ্জাবী অলংকার) তাদের প্রয়োগ। একদা পাঞ্জার অঞ্চলে প্রচলিত ধ্রুপদের নৌহারী বান-এর মধ্যে বেসরা-গীতির প্রাচীন বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। সাধারণী-গীতি বলতে মিশ্র গেয়-ভঙ্গি বোঝায়। এখানে মনে রাখতে হবে যে, একই রাগ বান বা বানী-ভেদে ভিন্ন রূপ ধারণ করে।

বান বা বানীর সঙ্গে রাগ-প্রকারের একটা গভীর সম্পর্ক মধ্যযুগীয় হিন্দুস্থানী রাগ-সংগীতেও। এখানে একটি কথা সবিশেষ উল্লেখ করা যায়। সেটি হচ্ছে গীতি বা বানী বললে শুধু যে নিবদ্ধ-গানটিকে বোঝাবে এমন নয়। অনিবদ্ধ, নিবদ্ধ এবং সমগ্র সংগীত পরিবেশন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যকেও বোঝাবে। এছাড়া, গীতি বা বানীর সঙ্গে রাগের সুর-কাঠামোর গভীর সম্পর্ক রয়েছে। যেমন –

I. আধুনিক কালের ভূপালী, মারবা ইত্যাদি প্রকৃতির রাগগুলির সঙ্গে ডগর-বানের।
II. আধুনিক দরবারী কানরা, পূরবী, কোমল আসাবরী, বিলাসখানি টোড়ি প্রভৃতি রাগগুলির সঙ্গে গওরহারী বা গোয়ালিয়রী বানের।
III. বর্তমানের মালকোষ, বাহার ইত্যাদি মধুর গমক-যুক্ত রাগগুলির সঙ্গে খাণ্ডার বানের।
IV. অধুনা প্রচলিত পাহাড়ী, সিন্ধু, কাফী প্রভৃতি চঞ্চল গতির রাগের সঙ্গে নওহার বানীর এবং
V. সংকীর্ণ বা মিশ্র প্রকৃতির রাগগুলির সঙ্গে সাধারণী গীতি বা মিশ্র বান, রূপে স্বীকৃত।

বর্তমান হিন্দুস্থানী সংগীতে এখন আর বান্ বা বানীকে মান্যতা দিয়ে গায়ক-গায়িকারা সংগীত পরিবেশন করেন না।

ভরত-মুনির 'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থে একটি চিত্তাকর্ষক তথ্য রয়েছে। সেখানে গান্ধর্ব নাট্য গীত ধ্রুবার সঙ্গে মার্গ-রাগের সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। প্রাচীন নাট্যে (নৃত্যনাট্যে) দুটি অঙ্ক (Act) বা দৃশ্যের (Seene) মধ্যবর্তি সাময়িক বিশ্রান্তিকে ‘নাট্য-সন্ধি বলা হত। ‘সন্ধি’ ছিল পাঁচ-প্রকার, যথা- ১. মুখ, ২. প্রতিমুখ, ৩. অবমর্শ, ৪. গর্ভ, ৫. নির্বহন।

প্রাথমিক ভাবে, গ্রাম-রাগের সংখ্যা ছিল মাত্র পাঁচটি, যথা - ষাড়ব, পঞ্চম, কৈশিক-মধ্যম, সাধারিত এবং কৈশিক। (মতঙ্গ-মুনি-বৃহদ্দেশী)।

যাইহোক, খ্রিষ্টোত্তর কালে এইসব প্রাচীন পদ্ধতি অবলুপ্তির ফলে রাগ-রাগিণীর বিপুল পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং প্রাচীন নিয়মাবলী বর্তমানে শুধু গ্রন্থের পৃষ্ঠায় বেঁচে রইল।

Reference:

১. মতঙ্গ-মুনি, বৃহদ্দেশী, বঙ্গাক্ষরে রূপান্তর: ড. প্রদীপকুমার ঘোষ; (১৯৮৬, তৃপ্তি ঘোষ), পৃ. ৭, ৬
২. নিঃশঙ্ক শার্ঙ্গদেব, সংগীত-রত্নাকর, অনুবাদ ড. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, (রবীন্দ্র ভারতী, ২০০১), রাগ – বিবেকাধ্যায়, পৃ. ৬৬